১৯০
দৈনিক বাংলা
তারিখ ... 2.0 JUL 1995
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১-৭

ঢাকা ভার্সিটিতে ভর্তির নিয়ম

সরকার শিক্ষা সম্প্রসারণের ওপর জোর দিয়েছেন। তার সুফলও ফলতে শুরু করেছে। বিগত কয়েক বছরে কেবল শিক্ষার হারই বাড়েনি– উচ্চশিক্ষার চাহিদাও ব্যাপকভাবে বেড়ে গেছে। এই বৃদ্ধির হার এমনই উচ্চ যে, উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষার্থীর ঠাঁই করাই মুসকিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। অধুনা পর্যায়ক্রমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় সাফল্যের চেয়ে পরবর্তী পর্যায়ের ভর্তির পরীক্ষায় সাফল্য অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হচ্ছে।

উচ্চশিক্ষার এই চাহিদা বৃদ্ধি নিঃসন্দেহে এক শুভ পরিবর্তন। মানবসম্পদের উন্নয়ন ব্যতিরেকে জাতীয় উন্নয়ন অকল্পনীয়। শিক্ষার মান আর মাত্রাকে জাতীয় উন্নয়নের সূচক গণ্য করা যেতে পারে। আর এ ক্ষেত্রে নেহাত সাক্ষরতার চেয়ে উচ্চতর পর্যায়ের শিক্ষার মূল্য যে অনেক অনেক বেশী, এ কথা ব্যাখ্যা না করলেও চলে।

চাহিদা যখন বাড়ে, প্রতিযোগিতা তখন অনিবার্য। আর এ জন্যেই বিভীষিকা সদৃশ ভর্তি পরীক্ষাও এড়ানোর উপায় থাকে না। আমাদের মত সীমিত সাধ্যের দেশে এ ধরনের ভর্তি পরীক্ষায় যোগ্য শিক্ষার্থী বাছাই করার চেয়ে প্রার্থী বাতিল করা বা ঝেড়ে ফেলার প্রবণতা প্রকট হয়ে ওঠাও অসম্ভব কিছু নয়। রাতারাতি সুযোগ সম্প্রসারণ সম্ভব হয় না বলেই গোজামিল দিয়ে টাল সামলানোর বাধ্যবাধকতা জন্মায়। আমাদের ক্ষেত্রে তাই ঘটেছে। দুঃখজনক হলেও এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই।

এমন একটা অবস্থায় বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থীর প্রতি অবিচার ঘটবে, এটাই প্রত্যাশিত। আর ঘটছেও। তবে এই অবিচারেরও রকমফের আছে। সুযোগের সীমাবদ্ধতায় একজন শিক্ষার্থীর প্রার্থিত শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হওয়া এক কথা, আর ন্যায্য সুযোগ থেকে বঞ্চিত হওয়া অন্য কথা। দ্বিতীয় মাত্রার বঞ্চনাই ব্যাপক হতে শুরু হয়েছে বলে ভয় হয়। ভয় হয়, আমাদের উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থাপনা দেশে এক নয়া শ্রেণীভেদ প্রথার জন্ম দিতে চলেছে। সংকট আরো বেশী ঘনীভূত হওয়ার আগে প্রতিকারের উদ্যোগ না নিলে বিষয়টি পরিতাপের কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

এ প্রসঙ্গে এদেশে উচ্চতর আধুনিক শিক্ষা প্রবর্তনের ধারার দিকে ফিরে তাকানোর দরকার আছে। আধুনিক শিক্ষার প্রবর্তনের মূলে গণচাহিদার চেয়ে রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনের তাগিদটাই ছিল বড়। ফলে, একটি শোষণকামী ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থায়ও উচ্চশিক্ষা রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব বলে স্বীকৃতি পায়। ঔপনিবেশিক শাসনের আধা শতক পরও এটাই প্রধান ধারা। প্রধান ধারা, তবে কিছু কিছু পরিবর্তনের ছোঁয়া লাগতে শুরু করেছে। চাহিদা বৃদ্ধির ফলে উচ্চতর শিক্ষার ব্যবস্থাপনা এবং আয়োজনে বেসরকারী উদ্যোগ দেখা দিচ্ছে। কলেজ তো বটেই, চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় থেকে শুরু করে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং হচ্ছে।

পরিপূরক উদ্যোগ হিসাবে এসব প্রতিষ্ঠানকে অবশ্যই স্বাগত জানানো যেতো, যদিনা এর সঙ্গে জড়িয়ে থাকতো শিক্ষা ক্ষেত্রে একটা বৈষম্যকে প্রকট করে তোলার ভয়। যে বৈষম্য নয়া শ্রেণীভেদ সৃষ্টির আশংকাও বহন করে।

উচ্চশিক্ষার চাহিদা বেড়েছে। বেড়েছে সুযোগ লাভের প্রতিযোগিতা এবং প্রতিযোগিতার তীব্রতা। মুক্ত বাজার অর্থনীতির এ যুগের অপর নাম প্রতিযোগিতার যুগ। এ উক্তি দিয়ে কিন্তু শিক্ষা সুযোগ সংক্রান্ত প্রতিযোগিতার সবটাকে সমর্থন করা যায় না। যেমন শহর আর গ্রামের শিক্ষায় এরই মাঝে যে বৈষম্য জাঁকিয়ে বসেছে তাকে সুস্থ বলে মানতে হলে অবিচারকেই স্বীকৃতি দিতে হয়।

এক সময় উচ্চশিক্ষা মাত্রই ছিল শহরভিত্তিক। শহরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো তাই তুলনামূলকভাবে দৃঢ়তার অবস্থান পেয়েছে। উন্নততর শিক্ষা দিতে পারছে। গ্রাম আর শহর দু'জায়গাতেই চাহিদা বেড়েছে। গ্রামের শিক্ষার্থীর পক্ষে শহরে ঠাঁই পাওয়া তাই ক্রমেই কঠিন হয়ে পড়ছে। চাহিদার গরজ থেকে গ্রামেও তাই উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠান জন্ম নিচ্ছে।

জন্ম নিচ্ছে বটে, তবে আয়োজন এবং অভিজ্ঞতায় পুরোগামী শহরে প্রতিষ্ঠানের নাগাল ধরতে পারছে না। সুযোগের তারতম্যের ফলে উচ্চতর শিক্ষার সুযোগ সংক্রান্ত প্রতিযোগিতায় গ্রামের ছেলে যদি পিছিয়ে পড়ে তার জন্যে কি তার যোগ্যতাকে দায়ী করা যাবে? ন্যায় বিচার বলে কিছু মানতে হলে এ দায় সমাজকেই মাথায় তুলতে হবে। আর এর ফলে বৈষম্য কেবল দীর্ঘস্থায়ীই হবে না, বাড়বেও।

বর্ণিত এ বৈষম্য উচ্চতর শিক্ষায় দ্রুত সম্প্রসারমান বৈষম্যেই একটি সামান্য দিক মাত্র। বড় বৈষম্যের কারণ হচ্ছে একই পর্যায়ের শিক্ষার বিভিন্ন মানের আয়োজন। প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক এবং কলেজ–বিশ্ববিদ্যালয়— এসব পর্যায়ে বিভক্ত শিক্ষার জন্যে দেশে যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে তার সকলেই সমমানের নয় এবং তাদের সমমানে আনার উদ্যোগও নেই। গ্রাম বিদ্যালয়ে আর শহুরে বিদ্যালয়ে যতটা পার্থক্য তারচেয়ে অনেক বেশী পার্থক্য একটি সাধারণ সরকারী বিদ্যালয় এবং ক্যাডেট কলেজ জাতীয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে। ভিন্নমানের শিক্ষার সুযোগ দিয়ে আমরা যখন শিক্ষার্থীদের কাছে একই মানের দক্ষতা আশা করি, আমাদের প্রত্যাশা সোনার পাথরবাটির চেয়েও অসম্ভবকেই দাবী করে। আয়োজনের এ ভিন্ন মান বর্ণবৈষম্যের মত বিভেদকেই প্রকট করে তুলছে।

উচ্চতর পর্যায়ে যেসব বেসরকারী প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে শুরু করেছে সাধারণ ঘরের কোন শিক্ষার্থীর পক্ষেই তাতে প্রবেশের উপায় নেই। এতে যে ব্যয় বহনের প্রয়োজন হয় তার সাধ্য স্বল্পসংখ্যক মানুষেরই থাকতে পারে। নেহাত অর্থের বলে কিছুসংখ্যক মানুষ বিশেষ সুবিধা ভোগ করে এগিয়ে যেতে পারছেন, এতেও আপত্তি ওঠা অস্বাভাবিক কিছু ছিল না। আপত্তি উঠছে না। কেননা, সামর্থকে ঠেকানোর সাধ্য অসমর্থের হওয়ার কথা নয়। দেশে বিশেষ ব্যবস্থা নিষিদ্ধ হলেও আন্তর্জাতিকতার এ যুগে বাইরের পথ রুদ্ধ করা যাবে না। আর এখন পর্যন্ত বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের আয়োজন সীমাবদ্ধ বলে এর প্রভাব ব্যাপক হবে না বলে ধরে নেয়া যায়।

একই সঙ্গে এমন একটা প্রত্যাশাও আছে যে বেসরকারী উদ্যোগ যদি সফল হয়, তার প্রভাব জাতীয় আয়োজনের ওপরও পড়বে। ত্রুটি সংশোধন করে শিক্ষার মান বাড়ানোর পথ এতে প্রশস্ততর হতে পারবে। সব মিলিয়ে, বৈষম্য সূচক হলেও, বেসরকারী উদ্যোগে উচ্চতর পর্যায়ের শিক্ষাকে আমরা স্বাগত জানিয়েছি। সব কিছু ঠিক থাকলে এ প্রসঙ্গ উত্থাপনেরই দরকার করতো না।

উচ্চতর শিক্ষার সাধারণ আয়োজনে সব কিছু ঠিক চলছে না বলেই কথাগুলো আসছে। শিক্ষার জাতীয় আয়োজনে বৈষম্যের ভিত ক্রমেই দৃঢ় এবং বিস্তৃততর হচ্ছে, এর আভাস আগেই দেয়া হয়েছে। এ বৈষম্য এখন ভিন্ন দিক থেকেও আক্রমণে উদ্যত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদাহরণ দিলেই বিষয়টা পরিষ্কার হবে।

এখনো দেশে উচ্চতর শিক্ষার সেরা অঙ্গন বলতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কেই বুঝায়। উচ্চশিক্ষা প্রত্যাশী প্রতিটি শিক্ষার্থী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার স্বপ্ন পোষণ করে থাকেন। যুক্তিগ্রাহ্য কারণেই সবার আশা পূরণ হয় না, হওয়ার কথাও নয়। কষ্টকর হলেও এ আশা ভঙ্গকে মেনে নিতে হয়। এখন যদি যুক্তির বাইরে গিয়েও কিছু প্রতিবন্ধক মাথা তুলে দাঁড়ায়, সান্ত্বনা কোথায় পাওয়া যেতে পারে?

এ সংক্রান্ত সাম্প্রতিক একটি খবর শিক্ষার্থী এবং অভিভাবক মহলকে গভীর দুশ্চিন্তায় ফেলেছে। খবরটি হচ্ছে এই, এর পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং কর্মচারীদের শিক্ষার্থীদের এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় পাস করার বাধ্যবাধকতা থাকবে না। ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণই তাদের ক্ষেত্রে যোগ্যতা বলে বিবেচিত হবে।

সকলেই এমন একটি সিদ্ধান্তকে অমানবিক এবং অবিবেকী বলে বিবেচনা করছেন। এর সমর্থনে বলার কথা একটাই আছে, আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করছি। অতএব, আমার সন্তান বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার অগ্রাধিকার পারে। একটু তলিয়ে দেখলেই এমন দাবীর অসারত্ব বুঝতে কারো অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার কাজ করার সঙ্গে যুক্ত সুযোগ–সুবিধা আমিই ভোগ করতে পারি। আমার সন্তান তার অধিকারী হলে বংশানুক্রমিক কায়েমী স্বার্থই বর্তায়। উচ্চতর শিক্ষায় একচ্ছত্র অধিকারের মাধ্যমে বংশানুক্রমিক ব্রহ্মত্ব প্রতিষ্ঠার মত ব্যাপার দাঁড়িয়ে যায়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট শিক্ষক–কর্মচারীর সংখ্যা কয়েক হাজার। সবার সন্তান একই সঙ্গে প্রার্থী না হলেও তা কয়েক হাজারে দাঁড়াবে অর্থাৎ দেশের সেরা শিক্ষাঙ্গনটি একটি বিশেষ শ্রেণীর জন্যেই বরাদ্দ হয়ে যাবে। যোগ্যতার প্রশ্ন আর থাকবে না। একটি গণতান্ত্রিক সমাজে এমন ব্যবস্থা কি করে কল্পনায় আসতে পারে তা আমাদের বুদ্ধির অগম্য।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে এমন একটা ব্যবস্থা চালু হলে চিকিৎসা, প্রকৌশল প্রভৃতি বিশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং অপরাপর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক কর্মচারীদেরও এমন দাবী থেকে দূরে রাখা সম্ভব হবে না। সম্ভব করার পক্ষে কোন যুক্তিও থাকবে না। আর তাতে করে, নতুন এক বৈষম্যই জন্ম নেবে।

শেষ খবরে জানা গেছে, বিষয়টি নিয়ে ভাবা হচ্ছে। এ সিদ্ধান্ত কার্যকর না হওয়ার সম্ভাবনাই সমধিক। আমরা এ খবরটিকে স্বাগত জানাই। আদপে এ নিয়ে ভাবারও কিছু নেই। এমনিতেই যে বৈষম্য জাঁকিয়ে বসেছে তা দূর করার কথা ভাবতে হবে। নতুন বৈষম্য সৃষ্টির সুযোগ বা প্রয়োজন নেই।

— সালেহ চৌধুরী